প্রথম অধ্যায়

দেশ কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিমল কর

সাহিত্য জীবন নির্ভর। জীবন ও জগতের নানা বিষয়কে সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন সচেতন সাহিত্যিক। সেই সাহিত্য ধর্ম-নির্ভর হোক বা রাজনৈতিক, সামাজিক, কাল্পনিক যাই হোক না কেন সাহিত্যিকের চতুর্পার্শ্বের জগৎ ও নিজের জীবনভাবনার প্রতিফলন সাহিত্যকে দেয় পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকার এবং এভাবেই ঘটে সম্পূর্ণতা। সাহিত্যিক তাঁর বক্তব্য বিষয়কে বা মনের অনুভূতিকে নানা পরিস্থিতির মাধ্যমে অর্থাৎ নানা কাহিনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে চান। এই ভাবে কাহিনী বা গল্প বা ঘটনার উত্থাপন লক্ষ্য করা গেছে সমস্ত সাহিত্যে। বেদ উপনিষদ, ব্রাহ্মণের মধ্যেও ছিল কাহিনী। এই কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে লেখক তাঁর উদ্দিষ্ট বিষয়কে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে ফুটে ওঠে লেখকের স্বকীয় জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন। তাঁর ব্যক্তিজীবন, জগৎ ও সমাজ সম্পর্কিত ভাবনা, নিজস্ব জীবনদর্শন, অনুভূতির মানচিত্র মিলিত হয় তাঁর জীবনদৃষ্টির সাথে। তাই সাহিত্য যে প্রকারের হোক না কেন সেখানে লেখকের উল্লেখযোগ্যতা থাকে তাঁর স্বকীয় জীবনদৃষ্টির প্রাবল্যে।

বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদের ঋষিরা সাহিত্যের মাধ্যমে যে ধর্মভিত্তিক আলোচনা করেছেন, সেখানে কাহিনীর অবতারণা ছিল। এই কাহিনী লক্ষ্যকেন্দ্রিক এবং এগুলি অধিকাংশই গল্পের দাবিতে অসম্পূর্ণ। তবুও এই কাহিনীগুলি আমাদের নজর কাড়ে। রামায়ণ, মহাভারতের মধ্যে রয়েছে প্রচুর খণ্ড খণ্ড কাহিনী, যেগুলি আধুনিক যুগেও বহু রচনার বীজ-মন্ত্র। প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত অপভ্রংশ সাহিত্যেও কাহিনীর অবতারণা ছিল। বাংলা সাহিত্যের আদি যুগের একমাত্র সাহিত্য হিসেবে পরিচিত 'চর্যাপদ'-এ পদকর্তারা বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার আচরণীয় ও অনাচরণীয় বিষয়গুলিকে প্রকাশ করেছিলেন যে পদের মাধ্যমে, সেখানে ধর্মের পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে মানুষের জীবনের বাস্তব সমস্যা ও যন্ত্রণার দিকগুলি, প্রকাশিত হয়েছে সামাজিক জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, শাসন ও দৌরাত্মের দিনলিপি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে টুকরো টুকরো কাহিনীর পাশাপাশি একটি সমগ্র কাহিনীর দ্যোতনা রয়েছে যা কৃষ্ণ ও রাধার প্রেম-সম্পর্কের সাথে জড়িত। শ্রীকৃষ্ণের দুরন্ত রাখাল বালকের মতো মানসিকতা, আদি রসাত্মক অনুভূতির আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি দেবত-সুলভ আচরণ এবং রাধার দেহমন্থনের মাধ্যমে হৃদয়-

মন্থনজাত অনুরাগ ও বিরহের হাহাকার, বড়াইর অপূর্ব দৌত্যক্রিয়া কাব্যের মাধ্যমে গল্পরসকে জমাট করে তুলেছে। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যেও উল্লিখিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের দেবতাসুলভ কাহিনী। মঙ্গলকাব্যগুলি কাহিনীর ভাণ্ডার— মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন সর্বত্রই এক বা একাধিক খণ্ডিত ও পূর্ণাঙ্গ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। জীবনী সাহিত্যের মাধ্যমে কবিরা তাঁদের গল্প প্রকাশের সাধকে নানা ভাবে সঞ্জীবিত করেছেন। প্রকৃত কাহিনীর পাশাপাশি অতিরঞ্জন দোষ কাহিনী রচনার গুণকেই সমৃদ্ধ করেছে। এই কাহিনীর অবতারণার সাথে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে যুক্ত হয়ে আছে মুসলমান কবিগোষ্ঠীর রোমান্টিক মানবজীবননির্ভর কাহিনী রচনার প্রচেষ্টা। দৌলত কাজির 'সতী ময়না', আলাওলের 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি কাব্যেও সুফী ধর্মের থেকেও বড় হয়ে উঠেছে মানব জীবনের গল্পকথা। এই গল্পের সাধ পূর্ণ করে গীতিকা বা গাথা সাহিত্যগুলি। মধ্যযুগের এই কাহিনী নির্ভরতার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় কোথাও বা পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর মাধ্যমে মূল বিষয়কে উপস্থাপিত করা হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে রয়েছে কাহিনীর খণ্ডিত রূপ বা ইঙ্গিত। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী কিংবা নাথ যোগীদের কাহিনী, বাউল গান, কবিগান, লালন ফকিরের গানে কাহিনীর পাশাপাশি রয়েছে ইঙ্গিতময়তা ও গভীর জীবনদর্শন যা বহু কাহিনীর কোরক। মধ্যযুগের সাহিত্য সবই পদ্যাকারে রচিত হলেও কিংবা ধর্মই অধিকাংশের মূল সারাৎসার হলেও কাহিনীর নীচে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়েছে সমকালীন মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চাওয়া-পাওয়ার আর্তি এবং জীবনযন্ত্রণার পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস, যা লেখকের রচনার অনবদ্য সঙ্গী হয়ে রয়েছে। কোন রচনাই আকস্মিক ও অহেতুক হতে পারে না, লেখকের জীবনদর্শন ও জীবনদৃষ্টির আলোকসম্পাত সমস্ত রচনারই প্রাণভোমরা।

আধুনিক যুগের কথাসাহিত্যে এই জীবন-ঘনিষ্ঠতা ও বাস্তবতা অনেক বেশি। কারণ আধুনিক যুগে সাহিত্য প্রকাশমাধ্যমের বৈচিত্র্যে বহু রূপ লাভ করে। মধ্যযুগের ছন্দময় পদ্য রচনার ধারা এখানে পুরোপুরি গৃহীত হয়নি। প্রকাশিত হয়েছে গদ্য ও কবিতার দুটি ধারা। গদ্য ধারায় প্রবন্ধের পাশাপাশি জন্ম নিয়েছে উপন্যাস ও ছোটগল্প। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাক্ষেত্রে নতুনত্বের সূচনা, বিদেশী শাসকের ভাষা ও শিক্ষাপ্রণালী অপেক্ষাকৃত বেশিসংখ্যক মানুষকে শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ এনে দেয়। এর সাথে প্রকাশিত হতে থাকে কিছু পত্রিকা। এই পত্রিকাগুলি বিভিন্ন ধর্ম ও প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হিসেবে প্রথম দিকে প্রচলিত হওয়ার পর সংবাদ ও সাহিত্যনির্ভর পত্রিকাও প্রকাশিত হতে থাকে, এবং এর ফলেই বাঙালির মানসমুক্তি ঘটতে থাকে ক্রমশ।

''পত্রিকাগুলি ত্বরান্বিত করল বাংলা গদ্যের বিকাশ। জীবনের এই নানা ব্যবহারিক কাজে অতিদ্রুত গদ্য হয়ে উঠল ভাবপ্রকাশের বাহন, তর্ক-যুক্তির প্রধান অস্ত্র, প্রাত্যহিকতার দূত।''[১] এই পত্রিকাগুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল যেগুলিকে সমালোচকেরা আখ্যানক, নক্সা, চূর্ণক নামে অভিহিত করেছেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'উপদেশক', 'বঙ্গমিহির', 'রহস্য সন্দর্ভ', 'পঞ্চানন্দ' প্রভৃতি পত্রিকাতে এই কাহিনীগুলি যেমন প্রকাশিত হয়েছিল, তারও আগে মনে রাখার মতো বিষয় এই যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যক্রম ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের তত্ত্বাবধানে কিছু প্রকাশিত গ্রন্থ বাঙালির কাহিনী পঠনের মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলেছিল।

আখ্যানক বা নক্সাজাতীয় রচনার পাশাপাশি তৎকালীন সময়ের আরও একটি অসাধারণ সৃষ্টি 'নভেলা' বা ছোট উপন্যাস, যা উপন্যাস রচনার গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এই জাতীয় রচনা। উপন্যাসের মাধ্যমে মানব জীবনের বাস্তব-ঘনিষ্ঠ বিস্তৃত রূপকে খুঁজে পাওয়া গেল। প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের উপন্যাস মানব জীবন তথা মানব সমাজকে স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করেছে। তাঁদের শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে তাঁরা বাংলা সাহিত্যকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন এক লহমায়। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলাল' উপন্যাসে কাহিনী, চরিত্র, জীবনদর্শন সর্বক্ষেত্রেই সমকালীনতাকে প্রকাশ করেছে। এ কারণে এটি একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজেও উল্লেখ করেছেন, ''আলালের ঘরে দুলাল' বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু 'আলালের ঘরে দুলালে'র দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সে রূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কিনা সন্দেহ।''[২] প্যারীচাঁদ মিত্রের পর বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসকে মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করালেন। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে নর-নারীর অবৈধ সম্পর্কের ও প্রেমের চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি যে মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন তার ফলেই পরবর্তী বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে মনস্তাত্ত্বিকতা একটি মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা কথাসাহিত্যের প্রাণপুরুষ হয়ে উঠেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'রাজর্ষি' ও 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস রচনার পর তাঁর তৃতীয় উপন্যাস রচনার মধ্যে প্রায় ষোল বছরের ব্যবধান ঘটে গিয়েছিল এবং সেই সময়ে তিনি রচনা করেছিলেন বেশকিছু ছোটগল্প, যা বাংলা

সাহিত্যে মণিমুক্তোর সাথে তুলনীয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ বা ১২৮৪ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিণী' প্রকাশিত হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সে লেখা সাহিত্য, যেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব প্রতিফলিত এবং রচনাশৈলীর দিক থেকেও তেমন নিটোল নয়। তবুও ছোটগল্পের ইতিহাসে এটির মর্যাদা আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বিশেষ অর্থে 'ছোটগল্প' শব্দটির প্রবর্তন করেছিলেন। ''বাংলা উপন্যাসের প্রথম শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র; মহাকাব্য, সনেট আর নাটকের স্রষ্টা মধুসূদন; আধুনিক গীতিকবিতার জনক বিহারীলাল। কিন্তু ছোটগল্পের প্রবর্তক ও প্রথম শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। এক্ষেত্রে তাঁর কোন পূর্বসূরী নেই।''[৩] রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি তিল তিল করে সঞ্চিত আবেগ অনুভূতি জীবনদর্শনের নিটোল মুক্তোর মতো। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্প লিখিত হয় যার বিষয় ছিল মানুষ ও প্রকৃতি। এই বিষয় নির্বাচনে কাল্পনিকতা ও অহেতুক রোমান্টিকতা প্রকাশ পায়নি। পারিবারিক জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে পদ্মাতীরবর্তী শিলাইদহ, পতিসর, কালীগ্রাম, সাজাদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাসকালীন প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্যের হাতছানি যেমন অনুভব করেছেন, তেমনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশার দুর্লভ সুযোগ ও ইচ্ছাকে অর্জন করেছেন, যে মানব সমাজ তাঁর ছোটগল্পের বিষয়। সাধারণ চাষা-ভুষা, শ্রমিক, চাকুরিজীবী, সাধারণ মানুষ, নারী ও শিশু চরিত্রের পাশাপাশি তাদের গহন অনুরাগ, মনস্তাত্ত্বিকতা তাঁর গল্পে পৃথক মর্যাদায় প্রতিফলিত হয়েছে। এই সময়কার কবিতা বা ছিন্নপত্রের পাতায়ও এই বিষয়গুলির প্রমাণ মেলে। ''সে সঙ্গে স্বীকার্য রবীন্দ্রনাথ কেবল পদ্মালালিত ভূখণ্ডের মানব সন্তানগুলিকে রোমান্টিক দৃষ্টিতে দেখেন নি, তাদের জীবনে ও নাগরিক জীবনে প্রবৃত্তির ঝড় উঠতে দেখেছেন, ভালোবাসার অপমান ও অবসান দেখেছেন, প্রণয়ের রোমান্টিক বেদনা ও অভিসম্পাত দেখেছেন। এক কথায় জীবনকে সমগ্রভাবে দেখেছেন।''[৪] তাই জীবনের ছোট ছোট দুঃখ-কথা নানা অনুভূতি সঞ্চারে নির্মাণ করেছে তাঁর ছোটগল্প।

'পোস্টমাস্টার' গল্পে রয়েছে হারানোর বেদনা। তবুও হৃত মানব মনটিকে ফিরে পাওয়ার জন্য কর্মকুশলতা দেখাতে পারেনি শহরের ছেলে, পোস্টমাস্টার। মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে বহু স্মৃতিকেই জীবন নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দেয়, যার পিছনে তার পূর্বপরিকল্পনা কিছুই থাকেনা --এই সত্য এই গল্পটির প্রাণ। 'শাস্তি' গল্পে নারীর অভিমানক্ষুব্ধ হৃদয়-বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। এই বেদনার পিছনে রয়েছে প্রেমাস্পদের সামান্য ভুল ও

অপরিণামদর্শী মিথ্যাভাষণের বিষময় ফল। 'দেনাপাওনা' গল্পে প্রকাশিত হয়েছে পণ-প্রথার যূপকাষ্ঠে একটি নারীর নিস্তব্ধ মৃত্যুর অতলে হারিয়ে যাওয়ার বেদনা। আবার 'নিশীথে', 'মনিহারা' প্রভৃতি গল্পে অতিপ্রাকৃত ঘটনার পাশাপশি মনস্তাত্ত্বিক আলোড়ন রবীন্দ্র-গল্পকে অসাধারণ উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্পেই মানব-মনের যে অতল বিস্ময় নানাভাবে মনস্তাত্ত্বিক আলোড়ন নিয়ে উপস্থিত তা পরবর্তীকালে ছোটগল্পকার দের মধ্যে গৃহীত হয়েছে।

রবীন্দ্র সমকালে যে গল্পকার রবীন্দ্রানুসরণের পথ থেকে সরে এসে, এমন কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী ও তৎপরবর্তী সময়কালের নতুন জীবনদৃষ্টির অনুসারী না হয়ে ব্যক্তিগত স্বকীয়তার প্রাবল্যে সামন্ততান্ত্রিক ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের যাঁতাকলে পতিত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের প্রেম, প্রীতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ-ঐশ্বর্য, স্নেহ-বাৎসল্যের ছবিকে অন্তরের অনাবিল সহানুভূতির প্রখরতায় উজ্জীবিত করে তুললেন তিনি হলেন অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিজস্ব ভাগ্যান্বেষণের অধিকার অর্জনের যে জোরালো দাবিকে তিনি পেশ করেছেন তা বিংশ শতকের নারী জাগরণের একটি সোপান। ''তিনি লিখেছেন পাড়া গাঁয়ের গরিব মানুষের ও গৃহস্থের মনোবেদনার কাহিনী। সে মনোবেদনার সঙ্গে তাঁর আবাল্য পরিচয় ছিল। এই সব কাহিনীতে কিঞ্চিত অতিশয়োক্তি আছে। সেইটুকু আছে নিজস্ব মশলার মতো। তা না থাকলে গল্পগুলি অমন জমত না''।[৫] তাঁর লেখা কয়েকটি গল্পের মধ্যে 'পথনির্দেশ' পৃথক মর্যাদায় অভিষিক্ত। নারী মনস্তত্ত্বের উদাহরণ গল্পটি। হিন্দু নারীর সংস্কার, সমাজের সমালোচনার ভয় একদিকে, অপরদিকে মানসিক চাঞ্চল্য; প্রমাস্পদকে অপমান, আবার কাছে আসার প্রবল ইচ্ছা, সংযম ও স্খলন সবকিছু মানসিক স্ববিরোধিতার পরিস্থিতি গল্পটিকে মর্মান্তিক পরিণতি এনে দিয়েছে। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে সামাজিক জাতিভেদ প্রথা, সামাজিক অনুশাসনের ফলে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের বাসনার কদর্যতম অপূর্ণাঙ্গতার চিত্র অঙ্কন করে লেখক সমাজ শাসকদের অত্যাচারী মানসিকতার পরিচয় ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের অসহায়তার পরিচয় দিয়েছেন। এই গল্পগুলির মধ্যে কথাশিল্পীর সহানুভূতির পরিচয় প্রতিটি ছত্রে ছত্রে বর্ণিত।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, যেখানে ভারতের সক্রিয় অংশগ্রহণ না থাকলেও ক্রমশ দেশীয় ও বিশ্ব রাজনীতিতে স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে প্লাবন নেমে আসে। সেই সময়কার নানা চিত্র সাহিত্যের মাধ্যমেই

মানুষের কাছে তাৎপর্যমণ্ডিত হওয়ার চেষ্টা করে। ব্যর্থতা, নৈরাশ্য, সংকট, বেকারত্ব, পলায়নবাদী মানসিকতা, আত্মবঞ্চনা, আত্মহত্যা, অবৈধপ্রেম, যৌনতা এই সময়ে কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে সাহিত্যে প্রভাব ফেলেছে একাকিত্ব ও মননসর্বস্বতা। বিশ্বযুদ্ধের পর বাঙালির মূল্যবোধের বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। যদিও এই পরিবর্তন অন্যভাবে বেশ কিছু বছর আগেই ঘটেছিল। উনিশ শতকের নবজাগরণে আপামর বাঙালি-জীবনে তেমন প্রভাব পড়েনি। বরং উনিশ শতকীয় শিক্ষিত বাঙালি কিছুটা ইংরেজের ধ্যানে মগ্ন ছিল। একদিকে ব্রিটিশ উপনিবেশ তার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত করে চলেছিল, অপরদিকে পাশ্চাত্য অনুকরণের মাধ্যমে মুনাফা লোভী ভারতীয়রা ইংরেজের কাছে ক্ষণিক সম্মান লাভের আশায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিচ্ছিল। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তেমন করে জাতির মনে সার্বিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। ইংরেজের কাছে এই নিজস্বতা হারানোর বিষময় ফলের কথা মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রকাশ করেছিলেন। নিজেদের অপরিসীম রত্নরাজিকে উপেক্ষা করে নিজভূমে পরবাসী হয়ে ভিখারী দশা গ্রহণের যে অপরিণামদর্শী আবেগ-সর্বস্বতা, তার যে বিষময় ফল অপেক্ষা করে আছে, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবু মানুষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে গর্জে উঠতে পারেনি। "উনিশ শতকের অন্যতম যুগলক্ষণ মানব প্রত্যয় হলেও, সে মানবতার মূল চেতনা মূলত ছিল সমাজ কেন্দ্রিক। এই সমাজ মুখীনতার অতিরেক অনেক স্থলেই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তখনও পর্যন্ত।।"[৬] সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার থেকেও বঙ্কিমচন্দ্র ও তৎপরবর্তী সাহিত্যে সমাজ কল্যাণের আদর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তার পিছনে রয়েছে লেখকের নিজস্ব ভাবানুভূতি।

বিমল কর বিশ শতকের চারের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। রবীন্দ্র-মত বিরোধিতা প্রকট ভাবে তাঁর সাহিত্যে লক্ষ্য করা না গেলেও তৎকালীন যুগলক্ষণ তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই যুগলক্ষণের সাথে আধুনিক সাহিত্যের নিবিড় যোগ লক্ষ্য করা যায়। তাই বিশ শতকের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং সাহিত্যের নানা পালাবদল, বিশেষত সাহিত্যের ভাবগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা প্রয়োজন। এই আলোচনার মাধ্যমে বিমল করের সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত ও তাঁর সাহিত্যের সম্বন্ধসূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

বিশ শতকের শুরু থেকে ভারতীয়দের জীবনে নেমে আসে নানা বিপর্যয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮), মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনা (১৯১৯),

জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, রাউলাট আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের অমানবিক দমন-পীড়ন নীতি মানুষকে দাঁড় করিয়ে দেয় চরম বিপর্যয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে; এর প্রতিবাদে শুরু হয়ে যায় অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০)। সাহিত্য এই জায়গায় থেমে থাকেনি, থেমে থাকতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ থেকেই এই আধুনিকতার প্রবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। তাঁর প্রবন্ধে ও কথাসাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজ শাসন ও তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা বাঙালি মনে কেমন ভাবে অপ্রাপ্তির বেদনা সঞ্চারিত করেছে তার চিত্র। 'চোখের বালি'-তে মানুষের মনের গোপন বাসনা ও প্রবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে চরিত্রের বিদ্রোহী মানসিকতার মাধ্যমে এবং তার সাথে লক্ষ্য করা গেছে সমাজের অচলায়তন ভাঙার প্রয়াস।

বিশেষ করে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সবুজ পত্র' পত্রিকা এই আধুনিকতা ও তার নব রূপায়ণে বিশেষভাবে অর্থবহ হয়ে উঠেছে। ''...শীর্ষ আধুনিকতার এই পর্বে কিন্তু প্রতীচ্য-কেন্দ্রিকতার আতিশয্যই ব্যতিক্রমহীন সত্য নয়, ঔপনিবেশিক আকল্পের প্রতি অতিমান্যতাকে অস্বীকার করে নিজস্ব অবস্থান ও উচ্চারণকে প্রকাশ করার জোরালো চেষ্টাও হয়েছে। আর এই চেষ্টার সূত্রধার 'সবুজ পত্র' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী।''[৭] রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে প্রমথ চৌধুরী 'সবুজ পত্র'কে যৌবনের দীপ্তিতে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলেন। তার সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন যুগধর্মের বৈশিষ্ট্যকে। 'সবুজ পত্রে' প্রাধান্য পেয়েছে আধুনিক মানুষের স্বতন্ত্র বিচারবুদ্ধি ও পুরোনোকে ভেঙে নতুনকে গ্রহণ করার সংস্কারহীনতা। কিন্তু এটাও উল্লেখ্য বিষয়, যৌবনের উচ্ছ্বাস থাকলেও তা বেপরোয়া মানসিকতা ও হঠকারী ভাবনাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠেনি। নব্যআধুনিকতার মধ্যে স্বকীয়তাকে বলি দেয়নি কিংবা বহির্বিশ্বের ভাবকে আপ্যায়ন করলেও বাঙালিয়ানাকে বিসর্জন দেয়নি এই সাহিত্য গোষ্ঠী। ''বস্তুত সে যুগের ভাব সঙ্কটের দিনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনবোধের প্রবল দ্বন্দ্বে যখন ভিতরে ভিতরে 'অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে' দিয়েছে -- সেই দিন বদলের কালে 'সবুজ পত্র' তার মননধর্মী পক্ষপাতহীন বিচার বোধের দ্বারা প্রবল প্রাণবন্যাকে সংহত করে নির্দিষ্ট 'বাস্তব' পথে সঞ্চারিত করার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, সন্দেহ নেই।''[৮] এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল 'ভারতী' গোষ্ঠীও। তারাও সাহিত্যে নতুনত্বকে গ্রহণ করার জন্য পক্ষপাতহীন হয়ে উঠেছিল। প্রাচীন কুসংস্কার ও অবক্ষয়কে দূর করে নতুনত্বকে পাথেয় করে যৌবন-দীপ্ত স্বরে যে প্রকাশ মহিমা 'সবুজ পত্র' দেখিয়েছিল তা ক্রমশ পরবর্তী কালে আরো জোরালো হয়েছে।

হয়তো তার রূপ বদল ঘটেছে বাহ্যিক ও আত্মিক ভাবে, তবুও সমাজের খোল-নলচে পাল্টে ফেলার প্রচেষ্টা এই সময়কালে তাৎপর্য মণ্ডিতভাবে স্পষ্ট হয়েছে।

কল্লোল পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে, এবং এর প্রচারের সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যের আরও একটি দিক বদল ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চরম মন্দার সৃষ্টি হয়। বেকারত্ব, শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিকদের ধর্মঘট এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ সংগঠিত হবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু অভাব, দারিদ্র্য ক্রমশ মানুষকে করে তুলেছে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। এর পাশাপাশি একের পর এক রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে উদ্ভুত সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা মানুষের নৈতিক বিপর্যয়কে সূচিত করে। গ্রামের মানুষ চাষবাস ছেড়ে শহরে চলে আসতে চেয়েছে চাকরির সন্ধানে, কিন্তু তা অপ্রতুল হওয়ায় তারা আরও গভীর সমস্যায় পতিত হয়েছে। একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন ও তার পাশাপাশি মানুষের একাকিত্ব, মানুষকে অসহায় করে তুলেছে। পরিবারে মেয়েরাও কাজের খোঁজে এসে লোভী মানুষের চক্রান্তের শিকার হয়ে অথবা নিজের ব্যর্থ জীবনের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে বাধ্য হয়েছে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে। পারিবারিক শৃঙ্খল ভেঙে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষের মনেও সন্দেহ, লোভ, জিঘাংসা ক্রমশ কলুষিত করে দিয়েছে তাদের হৃদয়কে। এই রকম দুর্বিষহ সময়ে প্রকাশিত হয়েছে 'কল্লোল' (১৯২৩), কালিকলম (১৯২৬), প্রগতি (১৯২৭) পত্রিকাগুলি। কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে কল্লোল গোষ্ঠী। এদের রচনায় সাধারণ মানুষের তৎকালীন পরিস্থিতি ও মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে জীবনের নানা বিপর্যয়, নেতিবাদিতা, অপরদিকে রোমান্টিক স্বপ্নচারিতার আবেশঘন মুহূর্ত তাদের সাহিত্যকে সমকালীন পরিস্থিতির সাথে একাত্ম করে তুলেছে। অর্থাৎ এই কবি-সাহিত্যিকরা খোঁজার চেষ্টা করছিলেন একটা নতুন জীবনপ্রত্যয় এবং পৃথক একটি সাহিত্যধারা ও প্রকাশভঙ্গি যা তাদের প্রতিষ্ঠা দেবে এই অবক্ষয়িত, যন্ত্রণাদগ্ধ সমাজের প্রকৃত রূপকার রূপে, দীপ্ত সূর্যের মতো ভাস্বর রবীন্দ্রনাথকে তাই এড়িয়ে গিয়ে পৃথক ভাবনায় নিজেদের নির্মিত করতে চেয়েছেন তৎকালীন লেখকেরা। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিলেন। "যাকে কল্লোলযুগ বলা হয় তার লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।"[৯] সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই লেখকেরা কঠিন বাস্তবের প্রতিরূপ দেখতে পাননি, তাঁদের মনে হয়েছে — "তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হলো তাঁর জীবনদর্শনে মানুষের

অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন।''[১০] যদিও রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', 'নষ্টনীড়', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে' ততদিনে জনসমাজে আলোড়ন ফেলেছে নিষিদ্ধ প্রেমের স্বরূপ অঙ্কনে। কিংবা 'শাস্তি', 'দেনাপাওনা'র মতো ছোটগল্পে সমাজের অন্যায় প্রথা ও দারিদ্র্যের ছবি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে ধ্বনিত হয়ে জনসমাজে প্রকাশিত হয়েছে। একাধিক কবিতায় মর্ত্যের মানুষের বিদ্রোহ ও জাগরণকে সম্মান জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ (যেমন 'এবার ফিরাও মোরে', 'দুই বিঘা জমি' প্রভৃতি কবিতায়)। তবুও এই রবীন্দ্র-মত বিরোধিতা তখনকার কবি ও সাহিত্যিকদের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে তাঁদের জন-সমাজে প্রকাশ লাভের ও খ্যাতি লাভের অনমনীয় পরাক্রমশালী ইচ্ছার সূত্র ধরে। তাই তো রবীন্দ্র-বিরোধিতার পাশাপাশি রবীন্দ্র-বরণের সুচিন্তিত আকাঙ্ক্ষা তাঁদের মনে অবচেতনে প্রকাশ লাভ করে। ''....এই আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন সেই সব তরুণ লেখক, যাঁরা সবচেয়ে বেশী রবীন্দ্রনাথে আপ্লুত; অন্তত একজন যুবকের কথা আমি জানি, যে রাত্রে বিছানায় শুয়ে পাগলের মতো 'পূরবী' আওড়াতো, আর দিনের বেলায় মন্তব্য লিখতো রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে।.... 'নিজের কথাটা নিজের মতো করে বলবো'-- এই ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠেছিল সেদিন, আর তার জন্যই তখনকার মতো রবীন্দ্রনাথ কে দূরে রাখতে হ'লো।''[১১] তৎকালীন তরুণ লেখকেরা কথা সাহিত্যের ধারাকে নতুন পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের গল্পে অবহেলিত, নিপীড়িত ব্রাত্যমানুষেরা যারা এতদিন দূরে দাঁড়িয়ে সভ্যমানুষদের নির্বাকভাবে দেখতো, তারাই গল্পে-উপন্যাসে নায়কত্বে ভূষিত হয়েছে। শ্রমিক, মুচি, মেথর, বেশ্যা, পকেটমার, ফুটপাথের ভিখিরি এরা সকলেই প্রকাশ করলো তারা আগে মানুষ তার পর তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিচয়। যাঁরা এই গোষ্ঠীর নন তাঁরাও তৎকালীন সময় চেতনা থেকে দূরে থাকতে পারেন নি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' গল্পে চটকলের শ্রমিক গফুরের কাছে নিজের মেয়ের আব্রুতা রক্ষার সংগ্রাম সাধারণ মানুষের অস্থিরতা ও অস্তিত্বের সংকট প্রকাশ করেছে।

দাম্পত্য জীবনের শিথিলতা, ভালোবাসার ওপর অবিশ্বাসের সর্পিল নিঃশ্বাস, মানসিক অসুস্থতা প্রকাশ পেয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'হয়তো', 'পোনাঘাট পেরিয়ে' প্রভৃতি গল্পে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মনীশ ঘটক, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের রচনায় সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতা ও আধুনিক ধনতান্ত্রিক জীবনের বিপর্যয় বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। যা রবীন্দ্রনাথের শুভবোধ ও মানুষের প্রতি বিশ্বাস না হারানোর

অঙ্গীকারের সাথে বেমানান। অর্থাৎ কল্লোলের লেখকেরা মুখ থেকে লাবণ্যের খোলস খুলে ফেলে তীব্র তীক্ষ্ণভাবে জীবন ও জগতের চিত্রকে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সেই রচনায় তৎকালীন সময়চেতনার পাশাপাশি ফুটে উঠেছে মানুষের মনের গহন অন্ধকারের রূপ। মনন-সর্বস্বতার পাশাপাশি মনোবিকলন, প্রেমের পাশাপাশি যৌনতা ও অবৈধ সম্পর্ক, হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার পাশাপাশি রোমান্টিক স্বপ্নচারিতা বাংলা সাহিত্যকে নতুন পথে, বিশেষত রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত পথে পরিচালিত করেছিল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'আবিষ্কার' কবিতাটিতে এই প্রতিজ্ঞা প্রকাশিত হয়েছিল--

> ''পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
> সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর,
> আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
> যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে।''[১২]

'কল্লোলে'র সময়ে যে পরিবর্তন সাহিত্য ও সমাজে ঘটে যায় তার প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে বহুদিন ধরে। বিশেষত পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের কাছে মানুষের ক্রম পরাজয় ঘটেছে ও তার ফলে তারা ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। এর পাশাপাশি দেশীয় ও বিশ্ব রাজনীতির মাধ্যমে একটা আলোড়ন দেখা দেয়। রাশিয়ার বলশোভিক আন্দোলন, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, চীন-জাপানের যুদ্ধ, হিটলারের রণনীতি এগুলি যেমন বিশ শতকের প্রথম অর্ধে বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছিল; এর পাশাপাশি বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতির নব নব আবিষ্কার ও তার ফল বা প্রভাব মানুষের চিন্তা ভাবনার মাত্রাকেও পরিবর্তিত করে তুলেছিল। তা যেমন উনিশ শতকের তেমনি বিশ শতকের চিন্তা-ভাবনাকে আলোড়িত করেছিল। (১)ডারউইনের বিবর্তনবাদ, (২)আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা -বাদ (Relativity Theory), (৩)ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণবাদ, (৪)মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও তার থেকে জন্ম নেওয়া সমাজতন্ত্রবাদ আধুনিক মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তনের হাওয়া নিয়ে এসেছিল। ''সমস্ত যুগদৃষ্টি, দর্শন, সাহিত্য, সমাজচিন্তা, রাষ্ট্রীয় চেতনাকে উক্ত মতবাদের ভাবপ্রভাব কোন রূপেই এড়াতে পারেনি শুধু নয়, সম্পূর্ণ রূপেই তাকে আত্মস্থ করেছে।''[১৩] ডারউইনের বিবর্তনবাদে প্রকাশিত হয়েছে জীবজগতের ক্রমবিবর্তনের রূপ। এই চলমান বিবর্তনে জীবের তথা মানুষের অবস্থানের কোন স্থিরতা নেই। জীব এখানে একটি সংখ্যা (Digit) বা এককের মতো, সময়ের প্রবাহের সাথে সাথে তা রূপান্তরিত হতে পারে। জীবনের এই অর্থহীনতা, পরিণামহীনতা

মানুষকে অসহায় করে তুলেছিল। আপেক্ষিকতা-বাদে (Relativity Theory) প্রকাশিত হয়েছে— বিশ্বে সবকিছুই বুদবুদ বা ফেনার মতো, তা প্রসারণশীল ও সঙ্কোচনশীল, স্থান (Space) বা কালের (Time) নিরিখে বস্তুর প্রকৃতির পরিবর্তন হয় এই মহাবিশ্বে। মানুষের জীবনে এখানে শুধু একঘেয়েমি বা ঘড়ির পেন্ডুলামের মত বিবর্তনহীন আসা যাওয়া। এর ফলে মানুষের অস্তিত্ব ও ভূমিকার প্রতি ক্রমশ সংশয় দেখা দিয়েছিল এবং তা থেকে জন্ম নিয়েছিল জীবন সম্পর্কে হতাশা ও নৈরাশ্য। মানুষের ব্যক্তিগত সাফল্য-ব্যর্থতা বা ভালো-মন্দের উপর একক মানুষের গুরুত্ব থাকলো না পরিবেশ, পরিস্থিতি, দেশকাল এবং পূর্বপুরুষের জিনগত বৈশিষ্ট্য ও মনের অবচেতন স্তরের উপর গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছিল মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৭) মতবাদে। তাঁর গবেষণাপত্র The Interpretation of Dreams, এবং The psychopathology of Everyday life, Wit and its relations to the Unconscious, Three Essays on the Theory of Sex প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে মানুষের অবস্থান, আচরণ, চিন্তাভাবনা, তার প্রয়োজনীয়তা সবকিছুর উপরই কিছু প্রশ্নচিহ্ন উঠে গেল। মানুষের মনের তিনটি স্তর Ego, Id এবং Super Ego -র বর্ণনার মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করেছিলেন অবচেতন মনই আমাদের নিয়ামক, এবং লিবিডোই হল একমাত্র প্রাণশক্তি ও সমস্ত ঘটনার কারণ। 'Sex is the main spring of our unconsious life' এই মতবাদ প্রকাশের ফলে প্রেমের ক্ষেত্রে দেহচেতনা ও যৌনতার শর্ত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল। তাঁর সহকারী অ্যাডলার, ইয়ুং এই ধারণাকে আরও গভীরভাবে প্রকাশে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই চিন্তাভাবনার মধ্যে যে নতুনত্ব ও আকস্মিকতা ছিল তার মধ্যে সব কিছুই একেবারে নৈরাশ্যজনক নয়। নতুন উপলব্ধি, নতুন দর্শনের মাধ্যমে জীবনকে নতুন ভাবে দেখার প্রচেষ্টা মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে। সচেতন প্রত্যাশাকামী মানুষের কাছে সেই সময় এসে পৌঁচেছে মার্কস, এঙ্গেলসের মতবাদ, যার থেকে জন্ম নিয়েছে 'সমাজতন্ত্র'। যেখানে প্রতিটি মানুষকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সমাজের সার্বিক ঐক্য বা জোটকে মূল্য দেওয়ার মধ্য দিয়ে। তাঁদের এই মতবাদ উনিশ শতকে প্রকাশ পেলেও তার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে। পৃথিবীর বিবর্তনের কথা মেনে নিয়েই সমাজের বিবর্তনকে এখানে অর্থাৎ মার্কস-এঙ্গেলসের মতবাদকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) এবং Das Capital (১৮৬৭) মানুষকে নৈরাশ্য থেকে তুলে এনে কল্যাণকর সামাজিক মিলনের মাধ্যমে ইতিবাচক ভাবনার বশবর্তী হবার পথ দেখিয়েছে।

ক্ষুদ্র ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা থেকে সরে এসে বিপুল সমাজ শক্তির মাধ্যমে ব্যক্তি তথা সমাজের উন্নতির কাঠামোকে শক্তিশালী করেছে এই মতবাদ --যা পৃথিবীর শুভকামী মানুষের কাছে আশাবাদ পোষণ করেছে। তাই লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে (১৯১৭-১৯২২) বলশেভিকদের দ্বারা পুরোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার অপসারণ করে নতুন সমাজতন্ত্র প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্বে বহুদেশে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজের পরিবর্তনের স্পৃহা জাগে মানুষের মধ্যে।

এই পরিবর্তন আনার জন্য মানুষের উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেলেও পৃথিবীর সর্বত্র তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। ক্ষমতাশীল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাছে মানুষের দাবি ও জীবন ক্ষয় পেতে শুরু করে। নানা অত্যাচার, অবিচারের মাধ্যমে মানুষের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করে ফ্যাসীবাদ। গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ও মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর আগ্রাসী থাবা বিস্তার করে তাদের নিঃশেষ করার ব্রতে ব্রতী হয় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, অসহায়তার শেষ সীমায় এসে দাঁড়ায় মানুষ। একদিকে শুরু হয়ে যায় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা দখলের লড়াই, জার্মান-ইংরেজ যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য দেশের অংশগ্রহণে সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪)। প্যারিসের শান্তিচুক্তি (১৯১৯) সংঘটিত হলেও পুঁজিবাদের আগ্রাসী নীতি সহসা বন্ধ হয় নি। মিত্রশক্তি জার্মানীকে শোষণের চেষ্টা করে তাকে অবক্ষয়ের শেষ সীমায় নামানোর আগেই হিটলারের রণনীতি তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে, এবং তার ফলশ্রুতিতে শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ইতিমধ্যে বিশ্ব রাজনীতিতে যে ঘটনাগুলি মানুষের জীবনে আরও ভয়াবহতা নিয়ে আসে তা হল স্পেনের গৃহযুদ্ধ (১৯৩১), ইটালীর আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) গ্রাস (১৯৩৬), জাপানের চীন আক্রমণ।

ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেনি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠা করে (১৯২৩) মানুষের মনে খানিক আশা সঞ্চারিত করলেও তার অকাল প্রয়াণে (১৯২৫) তা নষ্ট হয়ে যায়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কংগ্রেসের সাথে মতানৈক্য শুরু হয় ও তা বিরোধের আকার নেয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লবন আইন অমান্য আন্দোলনে গান্ধীজি ডান্ডি অভিযান করেন। এর পর শুরু হয় দেশ ব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন ও তার পাশাপাশি গান্ধী-আরউইন চুক্তি, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি। এছাড়াও ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যোসালিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা পায়, এবং ঐ বছরই কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ভারত শাসনবিধি (১৯৩৫) প্রচলন ও তার পাশাপাশি প্রগতি লেখক সঙ্ঘ

202078
20 MAR 2008

প্রতিষ্ঠিত হলে (১৯৩৬) রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত থেকে দরিদ্র-সাধারণ সকলের মধ্যেই তৎকালীন পরিস্থিতি ও মানসিকতা সম্পর্কে জোরালো প্রস্তুতি শুরু হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা হলে সমাজ সাহিত্য সর্বক্ষেত্রে প্রতিটি সাধারণ মানুষের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পিছিয়ে পড়া নির্যাতিত মানুষেরা একটি প্লাটফর্মে এসে দাঁড়িয়ে তৎকালীন ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়। খুব কাছ থেকে সাহিত্যের মাধ্যমে নিজের জীবনের পরিস্থিতিকে উপলব্ধির সুযোগ পেয়ে আগামী কর্ম নির্ধারণ করতে শুরু করে জনগণ।

যুদ্ধ-হত্যা-জীবনের ক্ষয় যখন বাইরের পৃথিবীতে সংঘটিত হয়ে চলে তখন লেখকেরাও সামাজিক দায়বদ্ধতার স্বার্থে তার প্রভাব সাহিত্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। লেখক ও পাঠকের মধ্যে তৈরি হয় সমভাবনার সেতু। সমালোচকের কথায় যথার্থভাবেই তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়-- ''...the quality which most clearly distinguishes literary material from mere experience is the value the writer has been able to give to it withen a dramatic or narrative framework. In much the sameway a reader will respond to the meaning of the novel and find it dramatic to the extent that he is able to realize it in terms of his own values. Ideally the writer and the reader should share the same values, so that the material which the writer select as valuable enough to write about will automatically be valuable to the reader.'' (After the lost generation: A critical Study of the writers of two wars, Alridge Joseph, Page-74)

ছোটগল্প যে পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে একাত্ম হয়ে সময়ানুযায়ী মানুষের জীবনের ও মনের পরিবর্তন ও দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্যের সাথে সাযুজ্য রেখে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠতে পারে তা এই সময়ের ছোটগল্পে প্রকাশিত হয়েছে। লেখকদের মনে যেমন আশাবাদ প্রকাশ পেয়েছে তেমনি সমকালীন অবক্ষয় ও নৈরাশ্যবোধকে নগ্নভাবে প্রকাশ করার স্বাধীনতা লেখকেরা দেখিয়েছেন। এই সময়কালকে অবলম্বন করে বেড়ে উঠছিলেন বিমল কর। তবুও বলতে হয় তাঁর ছোটগল্পে একটি পৃথক সুর ও ঐতিহ্য বার বার অবিচল, প্রশান্ত অথচ শক্তিশালীভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় পঞ্চান্ন বছর ধরে লেখা গল্পগুলির মাধ্যমে যেন একটি ঘরানা ও প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল। প্রত্যেক লেখকের রচনায় যে স্বভাবসিদ্ধ পৃথক সুর ও ভাবনা প্রকাশিত হয় তা লেখকের জীবনদৃষ্টির পার্থক্যের জন্যই ঘটে। সমকালীন দেশ-কালের ঘটনা প্রবাহ, পারিবারিক ঐতিহ্য,

সমকালের ঘটনা ও মানসিকতার সাথে পারিবারিক সম্পর্ক, প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তিত্বের সাথে লেখকের সম্পর্ক সমস্ত দিক থেকেই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মাধ্যমেই লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর জীবনদৃষ্টির মৌলিকত্বকে প্রকাশ করে।

লেখক বিমল করের জন্ম ২৪ পরগনার শাঁকচুড়া গ্রামে হলেও পারিবারিক কারণে তাঁকে থাকতে হয়েছে ও বড় হতে হয়েছে বাংলার বাইরে। পিতা, জ্যাঠামশাই, সেজো কাকা ছিলেন রেলে কর্মরত। সেই সূত্রে হাজারিবাগে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ছোট কাকা ইন্জিনিয়ার হলেও তিনি বাংলার বাইরে অবস্থান করেন। তাই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সময় বিমল করকে থাকতে হয় বিভিন্ন সময়ে হাজারিবাগ, জামাডোবা, কালীপাহাড়ী, বার্ণপুর, কুলটি, আসানসোল, বরাকর প্রভৃতি স্থানে। ব্যক্তিত্বময়ী ঠাকুমা শরৎকুমারীর ইচ্ছানুসারে একান্নবর্তী পরিবার ও মানসিকতার মধ্যদিয়ে বিমল করের প্রথম জীবনের কিছু অংশ কাটে। আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছলতা তাদের না থাকলেও মানসিক উদারতা, সম্পর্কের গভীরতা, ভালবাসার বিস্তৃতি, সহানুভূতির ব্যাপকতা এই পরিবারে কোন দিন ঘাটতি পড়েনি। এই ভালোবাসার প্রতি তৃষ্ণা বিমল করের জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত বজায় ছিল। পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ও বিস্তৃতির মধ্যেই তিনি চিরদিন আবদ্ধ থাকতে চেয়েছেন। ''মানুষের স্বভাব হল জলের মতন, নিচের দিকে গড়ায়। স্নেহ, ভালোবাসা, সহানুভূতি যেখানে জোটে সেখানে সে ছোটে।''[১৪] বিমল করের পারিবারিক ঐতিহ্যের মধ্যে যে বিষয়টি তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল তা হল সরলতা। ব্যক্তি-স্বার্থ ভুলে গিয়ে সকলেই পারিবারিক স্বার্থকে বেশি মূল্য দিতে চেয়েছেন। পিতার উদাসীনতা, নির্লোভ মানসিকতা তাঁকে অনেক ক্ষেত্রেই অবাক করেছিল। এর পাশাপাশি সেজো কাকার ব্যক্তিত্বের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিল। বাংলার বাইরে দীর্ঘদিন থাকতে হলেও ছোট পিসিমা, মেজো কাকা ও কাকিমার সাহিত্যবোধ ও সাময়িক পত্রিকা পাঠের প্রতি আকর্ষণ লেখকের অন্তর জগতে সাহিত্য-রস পিপাসাকে জন্ম দেয় একথা লেখক নিজেও স্বীকার করেছেন। ''কাকা কাকিমার পড়াশোনার চর্চা ছিল। বিশেষ করে সেজো কাকিমার। তখনকার কিছু মাসিক পত্রিকা কাকার বাড়িতে আসতো।''[১৫] 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা', 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী', 'নবশক্তি', 'প্রবর্তক', 'দেশ' পত্রিকা প্রভৃতি পত্রিকার সাথে বিমল করের যোগাযোগ ঘটেছিল কৈশোরেই। কৈশোরে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি পড়ে ফেলেছিলেন বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিশেষ করে 'কপালকুণ্ডলা', রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষী', শরৎচন্দ্র, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের কিছু উপন্যাস। চারু

বন্দোপাধ্যায়ের 'রচনা', মনীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা', বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালি' প্রভৃতি রচনা। এরও আগে শৈশবে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, সুকুমার রায়ের কিছু শিশুসাহিত্য, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুমার ঝুলি', 'ঠাকুরদার ঝুলি', সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'চালিয়াত চন্দর', হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যখের ধন', এছাড়া রামায়ণ, মহাভারতের গল্প পড়া হয়েছিল। অর্থাৎ পারিবারিক দিক দিয়ে সাহিত্যপাঠের একটা সুস্থ সংস্কৃতি তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। বিশেষ করে সেজো কাকিমা বিভিন্ন পত্রিকা ও গ্রন্থ পাঠ করার সুযোগ দিয়ে পরে তা আলোচনার ব্যবস্থা করতেন। এই পদ্ধতিতে মনোযোগ দিয়ে সাহিত্য পাঠের পাশাপাশি সাহিত্য সমালোচনার বিশেষ কৌশল ও তার প্রতি অনুরাগ রপ্ত করে ফেলেছিলেন বিমল কর। সেজো কাকিমার পড়তেন অনুরূপা, নিরুপমা দেবী, থেকে সীতা দেবী, শান্তা দেবী, প্রভাবতী দেবী পর্যন্ত, কবিতায় মানকুমারী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী থেকে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', 'সোনারতরী' পর্যন্ত। বিমল কর এই সময় গিরিবালা দেবী, পূর্ণশশী দেবীর সাহিত্যও পাঠ করেছেন বিভিন্ন পত্রিকার হাত ধরে। ''শৈলজানন্দরাও ততদিনে বাংলা সাহিত্যে পাকা আসন করে নিয়েছেন। নতুন হাওয়া লেগেছে বাংলা সাহিত্যে। তার দমকা বাতাস মফস্বলেও গিয়ে পড়ত।''[১৬] সাময়িক পত্রিকার হাত ধরে আধুনিক সাহিত্যের সাথে তাঁর এভাবেই যোগাযোগ। বিনম্র-চিত্তে তাই তিনি সেজো কাকিমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। এছাড়াও তাঁর কৈশোর জীবনে সাহিত্যবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য যাদের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁরা হলেন আসানসোল রেল স্কুলের আশুতোষ ভট্টাচার্য, যিনি পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন, সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রমোদ বাবু, কুলটি ম্যাকমিলান ইনস্টিটিউশানের হেড মাস্টারমশাই শৌরিপদ চট্টোপাধ্যায় এবং বউবাজারের খুড়তুতো দাদা-- দেবীপ্রসাদ কর (দাদামণি)। এই দাদামণির কাছ থেকেই বিমল কর আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা-গুলো শেখবার চেষ্টা করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকেই গ্রামীণ দারিদ্র্যের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হিসেবে কিছু মানুষের মধ্যে নগর-মুখীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। এই নগর-মুখী মানুষেরা শহরের গোলক ধাঁধায় পড়ে তাদের জীবনের যে পরিবর্তন ঘটালো তা সাহিত্যের বিষয় করে তুলেছেন সাহিত্যিকেরা। এছাড়াও নাগরিক জীবনে বিলাসিতা ও দারিদ্র্য, স্বার্থপরতার ক্লেদ ও বিশ্বাসের সারল্য, সেবা পরায়ণতা ও নিষ্ঠুরতা বা হিংস্রতা – এই বৈপরীত্যের ছবি পাশাপাশি এঁকে অসুন্দরের প্রকাশ মহিমার মাধ্যমে বরণ করা হলো নতুনত্বের। অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা

কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস সব দিকেই প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করে নতুন ভাবনা নতুন করে ভাববার অবকাশ এনেছিলেন সাহিত্যিকেরা। বিশেষত যুগধর্মের নিহিত তৎকালীন জীবনসমস্যা ও জীবনযন্ত্রণা প্রকাশের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন তৎকালীন কল্লোল গোষ্ঠী ও গোষ্ঠী বহির্ভূত কিছু সাহিত্যিক। সকলেরই কেন্দ্রীয় সুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে কল্লোল গোষ্ঠীর ভাবনার সাথে। ''যাকে বলে 'ম্যালাডি অফ দি এজ' বা যুগের যন্ত্রণা তা কল্লোলের মুখে স্পষ্ট রেখায় উৎকীর্ণ।''[১৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চোখের বালি'র ভূমিকা অংশে 'ঘটনা পরম্পরার বিবরণ' না দিয়ে 'তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো'র শুভ সূচনা করেছিলেন; যেখানে মনস্তত্ত্বই কথাসাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছিল কাহিনীর অতিরঞ্জন-ধর্মিতা থেকে। এই বৈশিষ্ট্য কল্লোল সমসাময়িক কাল থেকে বিশেষভাবে কথাসাহিত্যে — বিশেষ করে ছোটগল্পে প্রকাশিত হতে থাকে। কল্লোল পরবর্তীকালে বা কিছুমাত্রায় সমকালে নাগরিক চেতনার পাশাপাশি পল্লীজীবনের জীবনকথাকে কিছু সাহিত্যিক ফুটিয়ে তুললেও রোমান্টিক ভাব বিলাসে রূঢ় বাস্তবকে চাপা দেওয়ার অভিপ্রায় তাঁদের দেখা যায়নি, বরং পরিবর্তিত সময়ের পদচারণার সাথে সাথে গ্রামীণ জীবনের কাহিনী ও মানসিকতার বাস্তব তথ্যকেও সঠিকভাবে সাহিত্যে রূপদান করলেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের রচনায় তার স্বীকৃতি মেলে।

বিমল কর সেই সময়কার সাহিত্যের পাঠক হিসেবে সাহিত্যের ধারাটিকে বোঝার চেষ্টা করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পড়ার পাশাপাশি অন্যান্য লেখকদের রচনাও তিনি গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করার প্রেরণা পেয়েছিলেন। শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কাটলেও যৌবনের প্রথম লগ্নে বিমল কর উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসে পৌঁছান। কল্লোলিনী তিলোত্তমার জনকল্লোলে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের আই.এস.সি পাঠক্রম, কিংবা শ্রীরামপুর টেক্সটাইল কলেজের ইন্জিনিয়ারিং পড়াশোনা বা বিদ্যাসাগর কলেজের স্নাতক পাঠক্রমে খুব বেশি কৃতিত্ব না দেখাতে পারলেও বিমল কর এই মুহূর্তে তৎকালীন সাহিত্যের অনুরাগী হয়ে পড়েন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশ চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যের প্রতি কৌতূহলী হয়ে পড়েন।

রবীন্দ্র-মত বিরোধিতা বা প্রচলিত ধ্যান ধারণার বিরোধিতার জন্য তৎকালীন লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে যে তৎপরতা দেখা গেছিল, সে বিষয়ে তাঁরা অনেক বেশি শক্তি, সাহস ও দৃষ্টির বৈচিত্র্য

খুঁজে পেয়েছিলেন বিদেশী সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে। বিদেশী সাহিত্যপাঠের প্রবণতার বিষয়টি যদি আলোচনা করতে হয় তাহলে অবশ্যই মনে পড়বে উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যিকদের মধ্যেও এই বিষয়টি পরিলক্ষিত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু থেকে আরম্ভ করে মধুসূদন, রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র — এঁরা সকলেই বিদেশী সাহিত্য পাঠ করেছেন। এঁদের মধ্যে যেমন বিদেশী সাহিত্য অনুবাদের প্রচেষ্টা দেখা যায়, তেমনি তাঁদের স্বকীয় রচনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্য সাহিত্যের প্রভাবও পড়েছে। কল্লোল যুগের লেখকরা বিদেশী সাহিত্য পাঠ ও তার অনুসরণের কথা দৃপ্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র যেমন ভাবে হ্যামসুন, গোর্কির সাহিত্য পাঠ করে জীবনকে দেখবার সুযোগের কথা ব্যক্ত করেছেন। তেমনি কল্লোল গোষ্ঠীর বাইরে থেকেও এই প্রবণতার কথা স্বীকার করেছেন সজনীকান্ত দাস। ''_আমিও কন্টিনেন্ট সাহিত্যে পাঠ লইতেছি। ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, বোয়ার, ফ্লুট, হ্যামসুন -- বঙ্গবাসীর নিরামিষ অঙ্গনে তাজা রক্তের ছাপ পড়িতেছে। সে কি উত্তেজনা, কি উন্মাদনা। সেই ঢেউই চলিল 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি', 'উত্তরা' পর্যন্ত।''[১৮] এই বিদেশী সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন ইংরেজি সাহিত্য ছিল, তেমনি অন্যান্য বহু কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ ছিল, যার মাধ্যমে লেখকদের ভাবনার একাত্মতা ঘটেছিল ও তা বাংলা সাহিত্যে নতুনত্বের বিকাশে সম্ভব হয়েছিল। এঁরা ডস্টয়েভস্কি, টলস্টয়, টুর্গেনিভ, চেকভ, গোর্কি, ফ্লবের, জোলা'র রচনাকে আত্মস্থ করেছিলেন। রোম্যাঁ রোলাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে যেমন স্বাধিকার খুঁজে পেয়েছেন, তেমনি ডি. এইচ. লরেনস, হাক্সলির দর্শনে খুঁজে পেয়েছেন প্রেম ও যৌবন-চেতনার নতুন ঠিকানা। অর্থাৎ সমস্ত কিছুর দিক থেকেই নতুন প্রাণোন্মাদনা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়-নিষ্ঠতা এই সময়ের সাহিত্যিকদের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বিমল কর কলকাতায় থাকাকালীন বাংলা সাহিত্যের যে পরিবর্তন ঘটছিল তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিদেশী সাহিত্যের অবদানকেও উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি নিজেও বিদেশী সাহিত্য পাঠ করে বাংলা সাহিত্যের সাথে তার সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। বিদেশী সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে যেমন তাঁর একটি পরিচ্ছন্ন সাহিত্যবোধ গড়ে উঠেছিল, তেমনি তা ভবিষ্যতে তাঁর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও বিশেষ সহযোগী হয়েছিল। আগষ্ট আন্দোলন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে কলকাতা ছেড়ে বিমল কর যখন জামাডোবায় অবস্থান করেন তখন ভাগা রেল লাইব্রেরীর শরণাপন্ন হয়ে বিদেশী সাহিত্যের প্রতি পরিচিত হয়ে

ওঠেন। হামসুন, বয়ার, ইবসেন, টুর্গেনিভ, বুনিন, টলস্টয়ের রচনা পাঠ করে তিনি নিজের অন্তরসত্তাকে ক্রমশ জাগিয়ে তোলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক টালমাটাল পরিস্থিতি বিমল করকেও ভাবিত করে তুলেছিল। কংগ্রেসের ভারতছাড়ো আন্দোলন, জাপানের বোমার আক্রমণ, মানুষের কলকাতা শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া, আবার কয়েকদিন পর ফিরে আসা, এর পর '৪২-এর মর্মান্তিক ঘুর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, দুর্ভিক্ষ, এর পাশাপাশি ঘটে চলেছিল একাধিক কৃষক ও শ্রমিক বিদ্রোহ। রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) মাধ্যমে কৃষক শ্রমিকেরা খুঁজে পেয়েছিল তাদের বিপ্লবী শক্তির প্রাচুর্য। তাই গান্ধীজির অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলাকালীন সাধারণ মানুষের জাগরণে শুরু হয়েছিল কৃষক বিদ্রোহ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মঘট, গণশোভাযাত্রা, সুতাকল-চটকল শ্রমিকদের আন্দোলন প্রভৃতির মাধ্যমে এবং তা সফল করার ক্ষেত্রে সহায়তা করল বিভিন্ন কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন বামপন্থী দল গুলো। অসহযোগ আন্দোলন ও আগষ্ট আন্দোলনের পর উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠল তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৫-৪৬)। জমির স্থায়ী প্রজাসত্বের অধিকার, এবং উৎপন্ন ফসলের দুই তৃতীয়াংশ লাভের হকদার হওয়ার জন্য কৃষক সাধারণ এই আন্দোলনকে সংগঠিত করার চেষ্টা করে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, কাশ্মীর, তেলেঙ্গানাতেও কৃষক বিদ্রোহ একই সময় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মন্বন্তর বাংলার কৃষককুলকে চরমতম আঘাতের সম্মুখীন করেছিল। একদিকে বহু কৃষকের অসহায় মৃত্যু যেমন ভাবে দুঃখ, যন্ত্রণা হতাশার জন্ম দিচ্ছিল, তেমনি পাশাপাশি ঘটছিল ধনী জোতদারদের ক্রমশ কৃষকদের বঞ্চিত করে অর্থলোলুপ হয়ে ওঠা ও অর্থগর্বে স্ফীত হয়ে ওঠার মতো ঘটনা। —এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত করার জন্য কৃষককুল সম্মিলিতভাবে শপথ গ্রহণে প্রেরণা পেয়েছিল। মজুতদার ও কালোবাজারী ব্যবসায়ীদের অন্যায় ভাবে মজুতকৃত ফসল উদ্ধারের জন্য ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়েছিল গণ উদ্যোগ।

স্বাধীনতা আন্দোলনের এই সময়কালে বিক্ষিপ্তভাবে কিছুদিন বিমল কর কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। উত্তাল সেই দিনগুলি তাঁর স্মৃতি পটেও অম্লান ছিল। স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, ''কলকাতায় তখন কী ভয়ঙ্কর অবস্থা। কেমন এক অস্থিরতা, ক্ষিপ্ততা, বেপরোয়া ভাব। হরতাল, টিয়ার গ্যাস; পুলিশের গুলি; সৈন্যদের টহল চলেছে একদিকে অন্যদিকে মাথার ওপর জাপান বোমার আতঙ্ক। দিন কয়েক কোনো খবরের কাগজই বেরুলো না, একমাত্র 'স্টেটসম্যান' ছাড়া।''[১৯]

এই সময়কালকে বিমল কর তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন। দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে তিনি লেখেন তাঁর 'মানবপুত্র' গল্পটি। কলকাতা শহরে ভিড় করা ছিন্নমূল মানুষের অস্তিত্বের সংকট এই গল্পে বিশেষভাবে রূপ পেয়েছে। একদিকে অসহায় মানুষের ভিড়, অপরদিকে হঠাৎ আর্থিক দিক দিয়ে স্ফীত হয়ে ওঠা মানুষদের প্রবৃত্তি অসাধারণ মুন্সিয়ানায় লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। 'দেওয়াল' উপন্যাসেও এই সময়কালের নিখুঁত ছবি পরিবেশিত হয়েছে। 'দেওয়াল' উপন্যাসটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন ১৯৪১-এর মাঝামাঝি থেকে ১৯৪৫-এর প্রায় শেষ পর্যন্ত সময়ের বিশ্বাসযোগ্য দলিল। স্বাধীনতা আন্দোলন, কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দলগুলির ভূমিকা, মন্বন্তরের চিত্র, সমকালীন মানুষের অবস্থা সবকিছুই এই উপন্যাসে লেখক বর্ণনা করেছেন।

এর অব্যবহিত পরে ১৯৪৬ সালের দাঙ্গাও মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে যায়। স্বাধীনতা আন্দোলন, মন্বন্তর, তেভাগা আন্দোলনে বিপর্যস্ত চল্লিশের দশকে কলকাতা-কেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেই অশান্ত পরিবেশকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছিল। মানুষে মানুষে বিশ্বাস-বোধ ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা লোভের কারণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ''আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণের একটা যুক্তি আছে। কিন্তু যেটা দেখা গেল সেটা হল মুসলমান-প্রধান এলাকায় হিন্দু-নিধন, আর হিন্দু-প্রধান এলাকায় মুসলমান-নিধন। এবং এই নিধন অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। যেখানে আমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই সেখানে যাদের শত্রু মনে করি তাদের খুন করব, এটা নিষ্ঠুরতা ত বটেই -এটা একটা নির্লজ্জ কাপুরুষতাও। এই নিষ্ঠুরতা ও কাপুরুষতা তখন অত্যাচারীদের গৌরব বহন করে আনত। কলকাতার ১৯৪৬ এর দাঙ্গাতে অনেকে শিখল-- মানুষের প্রাণের কোন দাম নেই, শিখল-- অনেকে মিলে অল্প কয়েকজনের ওপরে অত্যাচার করার মধ্যে কোন অন্যায় নেই। এই দাঙ্গাতে পাড়ায় আধিপত্য পেল তারা ,যাদের আমরা আগে বলতাম গুণ্ডা, দাঙ্গার সময় বলতাম দাদা-ভাই আর পরে বলতাম মস্তান।''[২০]

আধুনিক ভারতবর্ষের এই দাঙ্গা ভারতবাসীদের কাছে লজ্জার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ধর্মের অঙ্গ যেহেতু সাম্প্রদায়িকতা নয়, সেহেতু ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে বীভৎস নারকীয়তার সৃষ্টি করতে পারে তা এই দাঙ্গার মাধ্যমে প্রকাশিত। বাংলার সাহিত্যিকরা মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন এই দাঙ্গার পেছনে ক্ষমতালোভী, মুনাফাখোর কতিপয় মানুষের প্রবৃত্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'খতিয়ান' গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাধ্যমে

শোষণ ও বঞ্চনার ছবি অঙ্কিত। রমেশচন্দ্র দত্তের 'সাদাঘোড়া' গল্পে মানুষের দাঙ্গার শিকার হয়েছে অসহায় পালিত পশু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উস্তাদ মেহের খাঁ' গল্পে কিংবদন্তি গায়ক যিনি সর্ব ধর্মের প্রতিভূ, অর্থাৎ গায়ক-শিল্পীর কোন সম্প্রদায় বা জাত নেই, তাকে খুন হতে হয় ধর্মের নামে পালিত যুদ্ধে। সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পে দুই ধর্মের মানুষই একই প্রবৃত্তিগত কারণে বাঁচতে চায়, অথচ যাদের সাথে এতদিন সুসম্পর্ক ছিল তারাই যখন শত্রু হয়েছে তখন সন্দেহের চোখে দেখাই স্বাভাবিক। তবু ডাস্টবিনের পাশে লুকিয়ে তারা দুজনেই একসাথে বিড়ি চেয়ে খেয়ে জীবনের হারানো সম্পর্কের উষ্ণতাকে ফিরে পাবার চেষ্টা করে। সোমেন চন্দ্রের লেখা 'দাঙ্গা', বনফুলের 'দাঙ্গার সময়' গল্পগুলি পরিস্থিতির উজ্জ্বল প্রমাণ।

বিমল কর এই সময়কালে রচনা করেন তাঁর 'অন্তরে' গল্পটি। দাঙ্গার পরিস্থিতিতে দুটি অসহায় নারী-পুরুষ কে নিয়ে লেখা গল্পটিতে তারা দুজনেই দাঙ্গার বিরুদ্ধে, কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পড়ে তারা নিরাপত্তার সন্ধান করেছে এবং মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসবোধকেই মূল্য দিতে চেয়েছে। কিন্তু দাঙ্গার সময় এই গল্পটি পশ্চিমবঙ্গের কোন পত্রিকায় ছাপা হয়নি। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পত্রিকার সম্পাদকও হয়তো এই দাঙ্গা নিয়ে ভাবিত ছিলেন। বিমল কর নিজেই জানিয়েছেন, ''পরাগ পত্রিকার জন্য ঠিক নয়, স্বরাজের (বন্ধু) কথায় একটি গল্প লিখেছিলাম দাঙ্গা নিয়ে। কেউ সেটা ছাপেনি। যে গল্পে একটি হিন্দু মেয়ে আর একটি মুসলমান ছেলের বিপন্নতার কথা আছে তা কেন ছাপা হয়না --আমি জানি না। গল্পে ছিল, এই দুটি ছেলেমেয়ে ঘটনাচক্রে বিপদের মধ্যে, কেউ কাউকে না জেনে --(এমনকি পরস্পরের উপস্থিতির কথা না জেনেও) একটি বাড়ির মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল আত্মরক্ষার জন্যে--। এই গল্পটি না ছাপার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু ছাপা হয়নি। কাশীর 'উত্তরা' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তী তাঁর কাগজের জন্যে নিয়ে গিয়ে ছাপেন।''[২১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে সমস্ত দিক থেকেই একটা পরিবতর্নের স্রোত দেখা গেছে। তা যেমন রাজনৈতিক তেমনি অর্থনৈতিক, যেমন সামাজিক তেমনি নৈতিক। তিরিশের দশক থেকেই এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল যা অনেক প্রকট রূপ ধারণ করে চল্লিশের দশকে, তা হল প্রেম ভাবনায় নতুনত্ব। উনিশ শতকের রচনাতে যে সমাজ বিগর্হিত বা নিষিদ্ধ প্রেমের স্বরূপ অঙ্কিত হয়েছিল এখানে তার সাথে মনোবিকলনের তত্ত্বও প্রযুক্ত হল। ফ্রয়েডের তত্ত্ব রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্যে প্রেমের ক্ষেত্রে সূচনা করেছিল দেহকামনা ও যৌনচেতনার। যুগধর্মের দিকে যদি দৃষ্টি দেওয়া যায়

তাহলে দেখা যাবে বিদেশী শোষণ ও দাসত্বের ফলে রাজনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সমাজ জীবনে লক্ষিত হয়েছে মানসিক অসন্তোষ। বেকারত্ব, মূল্যহ্রাস, কৃষিক্ষেত্রে মন্দা, অর্থনৈতিক অবক্ষয় সমাজ জীবনে মানুষের মনে এনে দিয়েছিল তীব্র অসন্তোষ। অনিশ্চিত জীবনকে কিছুটা সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে একদিকে ভেঙে যাচ্ছিল যৌথ পরিবারতন্ত্র, অপরদিকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে না পৌঁছানোর ফলে তীব্র মানসিক জ্বালায় অসৎ উপায়ে অর্থসৃষ্টির প্রবণতা মানুষের কাছে গৃহীত হচ্ছিল। এর প্রভাব পড়ে প্রেমের ক্ষেত্রেও। আর্থিক সুনিশ্চয়তা না থাকায় প্রেমের সাফল্যও থেকে যাচ্ছিল অধরা, কিন্তু মানসিক পিপাসা চরিতার্থ করার বাসনায় ভোগসর্বস্ব যৌনচেতনা হয়ে উঠছিল অবলম্বন। ''বাস্তবিক অর্থেই যুদ্ধ সমকালে প্রেম ক্রমশ দেহভাণ্ড ধরে বিকৃতিতে এসে পৌঁছায়। সেই বিকৃতি মেয়েদের ঠেলে দেয় গণিকাবৃত্তিতে, পুরুষেরা হয় লোভী, লম্পট, সুবিধাভোগী, আর গোটা সমাজ হয় দুষ্ট ক্ষতে বিব্রত, বিষাক্ত, তার অবক্ষয় তখন অবধারিত। সমকালের কথাশিল্পীরা তারই রূপকার।''[২২] ফ্রয়েড মনোবিকলন তত্ত্ব ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বেশ কিছু গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে যার মাধ্যমে তৎকালীন মানুষের কিছুটা স্বরূপ চিনে নেওয়া সম্ভব হতে পারে। এছাড়াও এই সময়ের কিছু গল্পের বিষয় হল মানুষের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা এবং তার প্রতি মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ। জগদীশ গুপ্ত, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অন্নদাশঙ্কর রায়, মনীষ ঘটক, মনোজ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু প্রমুখ গল্পকারেরা মানুষের জীবনের অন্ধকারময় প্রদেশে ফেলেছেন তীক্ষ্ণ আলো। যতটা দেখা গেছে তার থেকে যা দেখা যায়নি তার প্রতি আমাদের সচেতন করার প্রয়াস নিয়েছেন।

বিমল কর আধুনিক সাহিত্যের মনোবিশ্লেষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের চেষ্টা করেছেন। চরিত্রের অন্তর-জগতের অতলে ডুব দিয়ে সংগ্রহ করেছেন তার বৈচিত্র্যময় মানস-বৈশিষ্ট্য। তাঁর জীবনদৃষ্টির চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে গল্পের কিংবা উপন্যাসের চরিত্রগুলির মানবিকতার স্পর্শে। ''...বার বার তিনি খুঁজতে চেয়েছেন ব্যক্তির স্বাভিমানের রহস্য। তাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য কোন বৃহৎ কর্মকাণ্ড তাঁর দরকার হয় না। ব্যক্তির আভ্যন্তর সত্তার উন্মোচন ঘটে আনমনে, তখনই তার ভাবনার চেহারা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। বিমল কর ব্যক্তির সেই আভ্যন্তর সত্তার লেখক।''[২৩] বিমল করের এই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তাঁর গল্পে এসেছে মনস্তত্ত্ব, যৌনচেতনা, মানুষের

মনের অসহায়তা, বিষাদময়তা, মানবিক মূল্যবোধ, আর্থসামাজিক চিত্র এবং সর্বোপরি বেঁচে থাকার অদম্য উৎসাহ।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে নানা সমস্যা ঘুরে ফিরে আসতে থাকে। রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্থিরতা, শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনশীল মানসিকতা, সামাজিক জীবনের টালমাটাল পরিস্থিতি মানুষের কাছে সুস্থিরতা নিয়ে আসতে পারছিল না। ঘন ঘন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির পালাবদল এত দ্রুতহারে ঘটে চলেছিল যে, সাধারণ মানুষ তার সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। এই কারণেই স্বাধীনতা পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা গিয়েছিল মানুষদের মধ্যে চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, আত্মগোপনের মানসিকতা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে মানুষ যে স্বপ্ন দেখেছিল, জীবনের যে উদার প্রেক্ষাপট কল্পনা করেছিল, নতুন শাসক গোষ্ঠীর হাতে শাসনভার প্রদত্ত হওয়ার পর তাদের মধ্যে অনেকেরই মোহমুক্তি ঘটতে থাকে। এছাড়া বঙ্গ বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা মানুষ লাভ করেছিল তাও তাদের কাছে ঈপ্সিত ছিল না। তবুও দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অশান্তি থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছা মানুষের মনে জাগ্রত হয়েছিল। বিমল কর এই সব মানুষদের প্রতিনিধি হয়ে তৎকালীন পরিস্থিতিকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন স্মৃতি-চারণায় ও সাহিত্যের মাধ্যমে। ''জুন মাসের মাঝামাঝি থেকেই আমরা মোটামুটিভাবে ধরে নিলাম বাংলাদেশ ভাগ হচ্ছে। এই সময় বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়ে শেষ চালটুকু চালা হয়ে গেল। আজ আমরা যা কিছু ভাবিনা কেন--তখন--দাঙ্গা হাঙ্গামায় রক্তপাতে নরহত্যায় লুণ্ঠনে আর নানারকম অশান্তির মধ্যে মানুষের মন তিক্ত বিরক্ত হয়ে গেছে। পাকিস্তান হচ্ছে-- এটাও যেমন সত্য হয়ে দাঁড়াল, বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে--এটাও তেমন ঘটনা হয়ে দাঁড়াল।''[২৪] এক দল কমিউনিস্টরা মনে করতে শুরু করে ব্রিটিশ সরকার তাদের শাসনভার তাদের ভারতীয় সমর্থকদের হাতে তুলে দিয়ে গেছে। যাদের আদর্শবাদী রাষ্ট্রনায়ক মনে করা হয়েছিল সাধারণ মানুষ তাদের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। ''ক্ষমতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং ক্ষমতা-- এই দুইয়ের সম্পর্ক মাকড়সা এবং মাকড়সার জালের মতই জটিল ও সম্পৃক্ত।''[২৫] এর ফলে ১৯৪৭-এর পর থেকে দেখা যায় রাজনৈতিক অবক্ষয়, যা তৎকালীন মানুষদের ভাবিত করে তুলেছিল। গান্ধীজির মৃত্যু সেই অবক্ষয়ের সাথে যুক্ত। বিমল কর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে না দেখলেও মানবিক ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে এর বিরোধিতা করেছিলেন। ''...কি করেছিলাম আমরা? নিরীহ, নিরপরাধ, নিঃশঙ্ক একটি মহৎ জীবনকে হত্যা করেছিলাম নৃশংসভাবে, উন্মাদনার বশবর্তী

হয়ে। আর যথার্থ অর্থে না হলেও অন্য অর্থে এই মানুষটির সারাজীবনের সাধনাকে এবং জীবনকে বুঝি পশুর মতন ক্ষতবিক্ষত করেছিলাম। অহিংসচিত্ত একটি মানুষ হয়েছিল পাশব হিংসার ভক্ষ্য। মৃত্যুর পর নয় তার আগেই।''[২৬] এর পাশাপাশি কমিউনিস্টরা ক্রমশ সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে, তারা শ্লোগান তোলে 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়'। তৎকালীন বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের অপসারণ দাবি করে তারা। সরকারী বাস-ট্রাম জ্বালানোর পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায় ছাত্র আন্দোলন।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু হয়ে যায় নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নেওয়া হয় ১৯৫১ সালে। এই সময় থেকেই নগরায়ন ও শিল্পায়নের প্রতি সরকার বিশেষ উৎসুক হয়ে ওঠে। কলকাতা ভিত্তিক এই নগরায়নের ফলে কলকাতায় যেমন মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে তেমনি গ্রামীণ মানুষের সাথে কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পার্থক্য সূচিত হতে থাকে। গ্রাম থেকে মানুষের ঢল কলকাতার আর্থিক জীবনের সাথে যুক্ত হওয়ার অভিলাষে কলকাতায় এসে জমা হয়। এর পাশাপাশি পূর্ববঙ্গ থেকেও মানুষ নিরাপত্তার তাগিদে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভিড় বাড়াতে থাকে। ১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচন মানুষের মনে পরিবর্তনের প্রত্যাশাকে গভীরভাবে প্রদর্শন করে না। কিন্তু ১৯৫৩ সাল থেকে গ্রামের ভূমিস্বত্ব সংক্রান্ত ভাবনা গ্রামীণ মানুষের কাছে নতুন আশা সঞ্চার করে।

১৯৫৪ সালে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হয় এবং মানুষ প্রকৃতভাবে সাম্যবাদী জীবনের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠার প্রত্যাশা করে। ১৯৪৯-এ গণতান্ত্রিক চীনের জন্ম হওয়ার পর চীন এবং ভারতের সুসম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছু মানুষ আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৫৪-তে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর 'পঞ্চশীল' নীতির ভিত্তিতে চীন তীব্বত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় হওয়ার আশা থাকে, কিন্তু তা বাস্তবে সম্ভব হয়নি। ১৯৫৪ সালের জুন মাসে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ভারত সফরে নেহেরুর সাথে দীর্ঘ বৈঠকের পর আশাবাদ পোষণ করলেও ১৯৫৯-এর পর থেকে সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। এক সময় 'হিন্দী চীনি ভাই ভাই' শ্লোগান ব্যক্ত হলেও ১৯৬২-তে চীন ভারত সংঘর্ষে সেই ভ্রাতৃত্ব বিলুপ্ত হয়। ''কেউ কেউ বলেন দালাই লামাকে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়াই কাল হয়েছিল। চীন একেবারেই প্রসন্ন হয়নি। ...আবার কারও কারও ধারণা ভারত বা পণ্ডিত নেহেরু যতই 'পঞ্চশীল' করুন না কেন, আদতে ভারতের কোনো সুপরিকল্পিত বৈদেশিক-নীতি ছিল না। স্বাধীনতা পাবার পর থেকেই সে শুধু প্রতিবেশীদের সঙ্গে একটা সদ্ভাবের সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টাই করেছে-- তার বেশি কিছু নয়।

ফলে এক সময় প্রতিবেশীরাও আর ভারতকে গুরুত্ব দিত না। পাকিস্তান, নেপাল, চীন--কার সঙ্গেই বা সম্পর্ক ভাল থাকল।''[২৭]

চীন-ভারত সংঘর্ষের পর আর এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে ১৯৬৫-তে ঘটে গেল আর এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। ১৯৪৭-এর ১৫-ই আগষ্ট ভারত এবং পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার সময় পূর্ববঙ্গ 'পূর্বপাকিস্তান' নামে পাকিস্তানের অধীনে ছিল। কিন্তু কাশ্মীর নিয়ে সমস্যা ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে। ভারত পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার সময় কাশ্মীর ছিল হিন্দু রাজা হরি সিং শাসিত একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। এর পর পাকিস্তানি জঙ্গিদের আক্রমণে পর্যুদস্ত কাশ্মীর ভারতের মধ্যস্থতায় রক্ষা পায়। এরপর দীর্ঘ রাজনৈতিক চাপান উতোরে ১৯৬৫-র সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। রাশিয়ার মধ্যস্থতায় তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে ভারত-পাক সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করেন দুই দেশের রাষ্ট্র নায়করা। এই চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার কয়েক ঘন্টা পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু ঘটলে ভারতবর্ষের রাজনীতির পালা বদল শুরু হয় ইন্দিরা গান্ধীর মাধ্যমে। তাঁর আমলে আবার কাশ্মীর সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংঘর্ষ তীব্র হয়ে ওঠে। পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলি ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি বিজয়ী হলেও পূর্ব পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামি লিগ। মুজিবর রহমান এরপর স্বায়ত্বশাসন দাবি করলে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ২৫-শে মার্চ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর 'বাংলাদেশ' নামে পরিচিত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধে এবং পরবর্তীকালের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ছিন্নমূল বহু বাংলাদেশী শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গের আশ্রয় লাভের জন্য ভিড় করতে শুরু করে।

কমিউনিস্ট দলগুলি বার বার সংঘটিত করে তোলার চেষ্টা করেছে কৃষক ও শ্রমিকদের আন্দোলন। তেভাগা আন্দোলনের মত তেলেঙ্গানা আন্দোলনেও তার প্রকাশ ঘটে। হায়দ্রাবাদে তেলেঙ্গানা আন্দোলন ঘটলেও পশ্চিমবাংলায় তার প্রভাব পড়েছিল। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে এই ভাবে শুরু হয় কৃষক বিদ্রোহ। কিন্তু লক্ষ্য করার মত বিষয় স্বাধীনোত্তর কালে পশ্চিমবঙ্গের নানা রাজনৈতিক সংকট, খাদ্য আন্দোলন, ভূমি আন্দোলন দেখা দিলেও সাধারণ মানুষের অভাব বা দারিদ্র্য ঘোচেনি। কমিউনিস্ট দল মানুষে মনে আশা জাগিয়েও তা সার্বিক ভাবে পূরণ করতে পারেনি। কমিউনিস্ট দল সি. পি. আই, সি. পি. (আই) এম এবং আরো

অনেক উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। সমস্ত দিক দিয়ে ষাটের দশক পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উত্তাল একটি দশক হিসেবে পরিচিত হয়েছে। কংগ্রেসের পতন, যুক্ত-ফ্রন্টের দায়িত্ব গ্রহণ আবার পদচ্যুতি এইভাবে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা পশ্চিমবঙ্গকে ঘিরে ছিল। হেমন্ত বসুর খুন হওয়া, নকশালবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে খুনোখুনি, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করা, পুলিশি নির্যাতন, ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা ঘোষণা, কংগ্রেস সরকারের পতন, বামপন্থী দলের শাসন ভার গ্রহণ সবদিক থেকে সত্তরের দশকও ঘটনা বহুল ছিল।

বিমল কর তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে সমকালীন পরিস্থিতিকে সময়ানুগভাবে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। জরুরিঅবস্থা চলাকালীন সেই সময়কার যুবসম্প্রদায়ের মানসিক ভাবনা যেমনভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'শমীক' উপন্যাসে তেমনি 'যদুবংশ', 'অসময়' প্রভৃতি উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি সমকালীন জীবনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ভাবনাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তবুও এই সমস্ত গল্প কিংবা উপন্যাসে তৎকালীন পরিস্থিতির পাশাপাশি ফুটে উঠেছে মানুষের অন্তর্জগতের রহস্যলীলা। নকশাল আমলে লেখা 'সে', 'ওরা', কিংবা তার পরবর্তীকালে 'নিগ্রহ' গল্পে অথবা 'যদুবংশ' প্রভৃতি উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ উপেক্ষিত হয়নি। রাজনৈতিক ভাবনা বিমল করকে উৎসাহিত করেনি। সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধান, হিটলারের কর্মকাণ্ড, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং মানুষের চাহিদা অবস্থা ও পরিণতি তাঁর মনে নতুন জীবনদর্শন জাগ্রত করে। র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্টদের দলে সংযুক্ত হয়ে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে নিজেদের ভাবনাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। যদিও তা খুবই কম সময়ের জন্য, তবুও এই পথেই রাজনীতি সম্পর্কে কিছুটা হলেও মোহভঙ্গ ঘটেছিল। তাই কিছুটা দূর থেকে সমকালীন পরিস্থিতিকে জানার ও বোঝার চেষ্টা করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শ, জনযুদ্ধের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া, কংগ্রেস সোসালিস্টদের ভাবনাগুলি তাঁকে মুহুর্মুহু বিপর্যস্ত করে দিচ্ছিল। ৪৬'র দাঙ্গার সময় অকারণে পুলিশের স্বেচ্ছাচরিতার মাশুল দিতে তাঁকে কয়েকদিনের হাজত ও জেলবাস করতে হয়।

নিজের জীবনের সাফল্যের প্রতি(গুরুজনদের প্রদর্শিত পথে) উদাসীনতা দেখানোয় পারিবারিক দিক থেকে তিনি কিছুটা উপেক্ষিত হয়েছিলেন। এই রকম পরিস্থিতিতে অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে তাঁকে এগিয়ে আসতে হয়। এই পথেই তিনি অর্জন করেন বহু অভিজ্ঞতা, যা তাঁর সাহিত্য জীবনেও ছাপ রেখে গেছে। এ.আর.পি.তে চাকরি করা, আসানসোল ও বেনারসে রেলের চাকরি বিমল করের জীবনের একটি অধ্যায়। আসানসোল এবং বিশেষত বেনারসে চাকরি করতে গিয়ে

তাঁর মন বার বার চেনা জগতের প্রতি আকাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠত। কলকাতার জীবন, বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকতে এই মুহূর্তে তাঁর কষ্টবোধ হচ্ছিল, তাই কাজে তিনি মন বসাতে পারেন নি।

এক একটি মানুষ আমাদের জগতে প্রচলিত ভাবনার থেকে দূরবর্তী জগতে বাস করেন। বিমল কর সম্পর্কে একথা বলা যায়। পারিবারিক দিক দিয়ে লেখকের পিতা, জ্যাঠামশাই এবং সেজো কাকা এই রেলের চাকরিতে যেখানে সারাজীবন আপাত নিশ্চিন্তভাবে কাটিয়ে দিয়েছিলেন, সেই জীবন বিমল করের কাছে হয়ে উঠেছিল যন্ত্রণাদায়ক। সততা, নিজস্ব রুচিবোধ এবং পরিচিত মানুষ ও বন্ধুদের সাহচর্য, বিশেষ করে সাহিত্যবোধ ও সাহিত্য রচনা তাঁকে পৃথক একটি পথে সঞ্চরণের আহ্বান জানিয়েছিল, তাই সরকারি চাকরির নিশ্চিন্ত জীবনকে পিছনে ফেলে তিনি অনির্দেশ্যের প্রতি শুরু করেছিলেন তাঁর দৃপ্ত পদচারণা। তাঁর অর্থ উপার্জন ও জীবন অতিবাহিত করার দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছিল কলকাতাকে ঘিরে।

অসম সাহসী, ধৈর্যশীল আর্থিক সাফল্যের প্রতি কিছুটা উদাসীন বিমল কর সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাংবাদিকতার জীবনে বার বার কর্মক্ষেত্রে থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, আবার নতুন উদ্যমে শুরু করেছেন। 'পরাগ', 'পশ্চিমবঙ্গ', 'সত্যযুগ' পত্রিকায় নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে কাজ করার পর 'দেশ' পত্রিকায় চাকরি নেন এবং দীর্ঘদীন ধরে এর সাথে সংযুক্ত থাকেন। অবসরের পর কিছুদিন ধরে 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় সম্পাদক রূপে কাজ করেন। বর্ণময় এই জীবনে সাংসারিক ঘাত প্রতিঘাত তাঁর সংকল্পকে বিপর্যস্ত করতে পারেনি। সাহিত্য রচনার পাশাপাশি বার বার পত্রিকা প্রকাশের প্রতি তাঁর দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেছে। ছাত্রাবস্থায় কলকাতায় পা দেবার পর 'দাদামণি'র সাথে 'পূর্বমেঘ' পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে যার সূচনা হয়, পরবর্তীকালে 'ছোটগল্প : নতুন রীতি', 'গল্প বিচিত্রা' 'গল্পপত্র' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা ছোটগল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন বিমল কর। এই পত্রিকা গুলির মাধ্যমে যেমন নতুন ধারার গল্প প্রকাশ করার নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করার চেষ্টা করেছেন তেমনি বহু নতুন সাহিত্যিকের জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করেছেন; যাঁরা পরবর্তীকালে খ্যাতিমান সাহিত্যিক হয়ে উঠতে পেরেছেন। সাহিত্যের প্রতি এই ভালোবাসা এবং কর্তব্যবোধ বিমল করকে নতুনভাবে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এই কর্তব্যবোধ ও দৃষ্টান্তের ফল সুদূর প্রসারী; পরবর্তীকালের বহু সাহিত্যিকের কাছে গ্রহণীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত।

উৎস পরিচয়

১. 'বাংলা ছোটগল্প' -- শিশির কুমার দাশ, দে'জ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারী-২০০২, পৃষ্ঠা-১৯

২. 'আলালের ঘরে দুলাল', ভূমিকা-- 'বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান', বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ।

৩. 'কালের পুত্তলিকা'-- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২৩

৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৩১

৫. 'শরৎচন্দ্রিকা', শরৎ সাহিত্য সমগ্র, সম্পা : সুকুমার সেন, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ভাদ্র-১৩৯৩

৬. 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য', গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দে'জ পাব. ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-১৮

৭. 'আধুনিকতা ঃ পর্ব থেকে পর্বান্তর'-- তপোধীর ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপণি, জুলাই-১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৩১

৮. 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য', তদেব, পৃষ্ঠা-১৬

৯. 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', প্রবন্ধ সংকলন -- বুদ্ধদেব বসু, দে'জ পাব. নভেম্বর-২০০১, পৃষ্ঠা-৭৩

১০. তদেব, পৃষ্ঠা-৭৩

১১. তদেব, পৃষ্ঠা-৭৩

১২. 'আবিষ্কার'— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শতবার্ষিকী সংকলন মিত্র ও ঘোষ পাব. মাঘ-১৪১০, পৃষ্ঠা-১৫২

১৩. 'কবিতা, আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতা' —বারীন্দ্র বসু, রত্নাবলী, এপ্রিল-১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৫৪

১৪. উড়োখই (১ম পর্ব)--বিমল কর, আনন্দ পাব. সেপ্টেম্বর-২০০১, পৃষ্ঠা-১৫

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৮

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৯৭

১৭. 'কল্লোল যুগ'-- 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শতবার্ষিকী সংকলন' মিত্র ও ঘোষ পাব. মাঘ-১৪১০,পৃষ্ঠা-২৩৬

১৮. 'আত্মস্মৃতি'(২য় খণ্ড)—সজনীকান্ত দাস, নাথ পাবলিকেশন, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৬, পৃষ্ঠা-২০০

১৯. উড়োখই (১ম পর্ব)—বিমল কর, আনন্দ পাব. সেপ্টেম্বর-২০০১, পৃষ্ঠা-১৮৪

২০. 'আট দশক'--ভবতোষ দত্ত, প্রতিক্ষণ পাব. প্রাঃ লিঃ, নভেম্বর-১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১১৮

২১. উড়োখই (১ম পর্ব)--বিমল কর, আনন্দ পাব. সেপ্টেম্বর-২০০১, পৃষ্ঠা-২৫৮

২২. 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্য'—ড. মীরা ঘোষ, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-২৪৩

২৩. 'আলাপ ঃ সংলাপ ঃ সম্ভাষ'—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাব. ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৭৯

২৪. উড়োখই (১ম পর্ব)—বিমল কর, আনন্দ পাব. সেপ্টেম্বর-২০০১, পৃষ্ঠা-২৭১

২৫. বাংলা কথাসাহিত্যের একাল—বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর-১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৫৪

২৬. উড়োখই (১ম পর্ব)--বিমল কর, আনন্দ পাব. সেপ্টেম্বর-২০০১, পৃষ্ঠা-২৮২

২৭. উড়োখই(২)--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, জুলাই-১৯৯৭,পৃষ্ঠা-১০৬